২। হুমায়ুনের সঙ্গে শেরশাহের সংঘর্ষের ঘটনাবলির ধারাবাহিক বর্ণনা দিন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ

পাঠ-১ ঃ ১। (গ); ২। (খ); ৩। (খ); ৪। (গ); ৫। (ক)।
পাঠ-২ ঃ ১। (ক); ২। (খ); ৩। (ক); ৪। (গ); ৫। (গ)।
পাঠ-৩ ঃ ১। (খ); ২। (ঘ) ৩। (গ); ৪। (ক); ৫। (গ)।

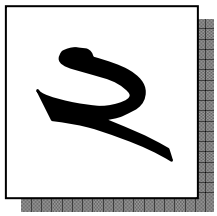

ব্রিটিশ ও বাংলায় আফগান শাসন

শূর আফগান দলপতি শেরশাহ ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবুর পুত্র হুমায়ুনকে বিলগ্রামের যুদ্ধে (১৫৪০খ্রি.) পরাজিত করার মাধ্যমে শেষবারের মত আফগান জাতি দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে উত্তর ভারত এবং বাংলায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভারতের প্রাচীন শাসন ব্যবস্থার সংস্কার সাধনপূর্বক দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। হুমায়ুন কর্তৃক দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধারের আগ পর্যন্ত শেরশাহ ও তাঁর বংশের উত্তরাধিকারীগণ ভারতবর্ষ শাসন করেন। শেরশাহ ও তৎপুত্র ইসলাম শাহের রাজত্ব পর্যন্ত বাংলা দিল্লির অধীনস্থ প্রদেশ হিসেবে শাসিত হতো। তবে ইসলাম শাহ পরবর্তী দিল্লির শূর আফগানদের শাসনামলে বাংলার শাসনকর্তাগণ এবং কররানী আফগানগণ (আফগানদের অন্য একটি গোত্র) স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেন। বাংলায় কররানী আফগান শাসকদের অন্যতম শাসক দাউদ কররানীকে মুঘল সম্রাট আকবর পরাজিত করে বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। আলোচ্য 'দিল্লি ও বাংলায় আফগান শাসন' ইউনিটে শেরশাহ কর্তৃক দিল্লির সিংহাসন আরোহণ, তাঁর রাজ্য বিস্তার, শাসন সংস্কার, চরিত্র ও কৃতিত্ব এবং বাংলায় শূর ও কররানী আফগান শাসন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত ইউনিটকে নিম্নোক্ত দুটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে ঃ

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- পাঠ-১. শেরশাহ;
- পাঠ-২. বাংলায় আফগান শাসন।

পাঠ - ১

শেরশাহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *শেরশাহের বাল্যজীবন, সাসারামের জায়গীরদাররূপে অধিষ্ঠান এবং মুঘল-আফগান সংঘর্ষে জয়ী হয়ে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ প্রভৃতি ঘটনা সম্পর্কে জানবেন;*
- *শেরশাহের রাজ্যবিস্তারের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *শেরশাহের শাসন ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *শেরশাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।*

মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসে শেরশাহ অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। শেরশাহের অভ্যুত্থান তাঁর কর্মদক্ষতা ও প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সার্থক সংগ্রামের ইতিহাস। তাঁর পিতা হাসান জৌনপুরের শাসনকর্তা জামাল খাঁ লোহানীর অধীনে প্রথমে পাঞ্জাবে কর্মে নিযুক্ত হন এবং পরে জৌনপুরের অন্তর্গত সাসারামের জায়গীরদার হন। শেরশাহের বাল্যনাম ছিল ফরিদ (জন্ম ১৭৪২ খ্রি.)। তাঁর বাল্যজীবন বিমাতার অনাদর এবং লাঞ্ছনার সকরুণ ইতিহাস। বিমাতার প্ররোচনায় পিতা হাসান পুত্র ফরিদের প্রতি সম্পূর্ণ নিস্পৃহ ছিলেন। যুবক ফরিদ এই প্রতিকূল অবস্থায় বাইশ বৎসর বয়সে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র জৌনপুরে গমন করেন। অসাধারণ মেধাবী ফরিদ অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে জামাল খাঁ পিতা ও পুত্রের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করেন। সাসারামে প্রত্যাবর্তন করে ফরিদ রোটাসে দু'টি পরগণার (সাসারাম ও খোয়াসপুর) পরিচালনার ভার পান। এভাবে ফরিদের শাসনকার্য বিষয়ে শিক্ষার সূচনা হয়। কিন্তু তাঁর এই কৃতিত্বে ঈর্ষান্বিত হয়ে বিমাতা চক্রান্ত করে তাঁকে পুনরায় গৃহত্যাগে বাধ্য করেন। পিতার মৃত্যুর পর দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদির প্রদত্ত অধিকার বলে তিনি সাসারামের পৈতৃক জায়গীর লাভ করেন। অতপর ১৫২২ খ্রি. বিহারের

সুলতান দারিয়া খাঁন লোহানীর পুত্র বাহার খাঁর অধীনে চাকরি নেন। এ সময়ে একবার সুলতান বাহার খাঁর সঙ্গে শিকারে গিয়ে ফরিদ কারো সাহায্য ছাড়া একাই একটি বাঘ মেরেছিলেন বলে তাঁর সাহসিকতার জন্যে সুলতান কর্তৃক 'শের খাঁ' উপাধিতে ভূষিত হন।

কিন্তু ভাগ্য বেশিদিন তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন রইল না। শত্রুদের প্ররোচনায় তিনি পুনরায় তাঁর পিতার জায়গীর থেকে বিতাড়িত হন। এই সময় বাবুর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রি.) ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করলে শের খাঁ মুঘলদের শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে বাবুরের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। বাবুরের সহায়তায় তিনি সাসারামের জায়গীর ফিরে পান (১৫২৮ খ্রি.)। এর কিছুদিন পর বিহারের সুলতান বাহার খাঁর মৃত্যু হলে শের খাঁ বিহারের নাবালক শাসনকর্তা জালাল খাঁর অভিভাবক নিযুক্ত হন।

ধীরে ধীরে সৈন্যবাহিনীর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে তিনি বিহারের প্রকৃত শাসনকর্তায় পরিণত হন। এই সময় চুনার দুর্গের অধিপতি তাজ খাঁর মৃত্যু হলে তিনি তাঁর বিধবা পত্নীকে বিবাহ করে চুনার দুর্গের অধিপতি হন (১৫৩০ খ্রি.)। শের খাঁর এই অস্বাভাবিক ক্ষমতাবৃদ্ধিতে আফগানগণ ঈর্ষান্বিত হয়। সুলতান জালাল খাঁ শের খাঁর অভিভাবকত্ব থেকে মুক্ত হতে চাইলেন। তিনি বাংলার সুলতান মাহমুদ শাহের সাহায্যে শের খাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলে শের খাঁ ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে সুরুজগড়ের যুদ্ধে বাংলা ও বিহারের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে বিহারের শাসন ক্ষমতা অধিকার করেন। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে কার্যত তিনি বিহারের সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হলেন। এই সময়ে তাঁর ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে আফগান অভিজাতবর্গ তাঁর নেতৃত্বাধীনে সমবেত হন।

পাঠান-মুঘল সংঘর্ষ

সুরুজগড়ের যুদ্ধে জয়ী হয়ে শের খাঁ বাংলায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের গুজরাট অভিযানের সুযোগে শের খাঁ গৌড়ের নিকট উপস্থিত হলে দুর্বল মাহমুদ শাহ তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেন। সন্ধির শর্তানুযায়ী তের লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ও শিউল হতে সক্‌রিগলী পর্যন্ত শের খাঁকে দিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু এতেও বাংলা আফগান আক্রমণ থেকে রক্ষা পেল না। ১৫৩৭ খ্রি. বাংলা অধিকার করার জন্যে শের খাঁ পুনরায় বাংলা আক্রমণ করে গৌড় অবরোধ করেন। এই সময় হুমায়ুন গুজরাট অধিকার সমাপ্ত করে আগ্রায় সুখে কালাতিপাত করছিলেন। শের খাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে হুমায়ুন অবশেষে তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু হুমায়ুন বাংলায় না গিয়ে শের খাঁর চুনার দুর্গ অবরোধ করেন (১৫৩৭ খ্রি.)। এই সুযোগে শের খাঁ গৌড় এবং রোটাস দুর্গেও নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। হুমায়ুন বাংলায় গেলে শের খাঁ তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে না গিয়ে বিহার, জৌনপুর, কনৌজ পুনরুদ্ধার করেন। শের খাঁর এরূপ কার্যকলাপে হুমায়ুন চিন্তিত হন এবং তিনি আগ্রায় প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। ফেরার পথে বক্সারের নিকট চৌসায় ১৫৩৯ খ্রি. হুমায়ুনের সঙ্গে শের খাঁর সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে হুমায়ুন সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে কোন রকমে প্রাণ নিয়ে আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করেন। শের খাঁর রাজ্য লাভের ইতিহাসে অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা হলো চৌসার যুদ্ধে জয়লাভ। এই বিজয় দ্বারা শের খাঁ বাংলা, বিহার ও আসামের এক বিস্তৃত অঞ্চলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন এবং 'শেরশাহ' উপাধি গ্রহণ করে নিজনামে মুদ্রা অঙ্কিত করেন। পরের বৎসর ১৫৪০ খ্রি. হুমায়ুন পুনরায় শেরশাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে কনৌজ বা বিলগ্রামের যুদ্ধে পুনরায় চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে হুমায়ুন সিংহাসনচ্যুত হয়ে ১৫৪০–১৫৫৫ খ্রি. পর্যন্ত পনর বৎসর দেশ থেকে দেশান্তরে আশ্রয়ের খোঁজে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হন। অন্যদিকে শেরশাহ উত্তর ভারতের অবিসংবাদী শাসকরূপে দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

শেরশাহের রাজ্য বিস্তার

দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে শেরশাহ পাঞ্জাব অধিকার করেন। এই সময়ে (১৫৪১ খ্রি.) বাংলার শাসক খিজির খাঁ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তিনি পাঞ্জাব থেকে বাংলায় এসে খিজির খাঁকে বন্দি করেন। অতপর তিনি বাংলায় নতুন এক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। সামরিক ব্যবস্থার পরিবর্তে বেসামরিক শাসন কায়েম করেন। শেরশাহ বাংলাকে ১৯টি সরকারে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি সরকারের শাসনভার একজন আমীনের ওপর অর্পণ করেন। বাংলার শাসকরূপে তাঁর এক বিশ্বস্ত অনুচরকে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি বাংলার শাসনকর্তাকে 'আমীন-ই-বাংলা' উপাধিতে ভূষিত করেন।

অতপর তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারে রাজপুতনার দিকে মনোনিবেশ করেন। ১৫৪২ খ্রি. তিনি মালব অধিকার করেন। মালব থেকে আগ্রা প্রত্যাবর্তনের পথে রণথম্ভোর দুর্গ অধিকার করেন। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা হায়াৎ খাঁ নিজামী পাঞ্জাবের মন্টোগোমারী জেলার বিদ্রোহী ফথ খান জাঠকে দমন করে পরে মুলতান অধিকার করেন। ১৫৪৩ খ্রি. শেরশাহ সিন্ধুর ভাক্কার ও সেহওয়ান দুর্গ দু'টি অধিকার করেন। একই বৎসর চান্দেরী ও রাইসিন দুর্গ অধিকার করেন। অতপর তিনি মাড়ওয়ারের মালদেবের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে তিনি রাজপুত সেনাপতিদের পরাজিত করেন। ঐ বছরই তিনি যোধপুর অধিকার করেন। ১৫৪৪ খ্রি. মেবারের রাজধানী চিতোরের পতন ঘটে।

শেরশাহের সর্বশেষ অভিযান ছিল বুন্দেলখন্ডের কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ। আহমদ ইয়াদগারের বিবরণ থেকে জানা যায়, সাম্রাজ্যহারা হুমায়ুনের সঙ্গে কালিঞ্জরের রাজা বন্ধুত্ব রেখেছিলেন। এই কারণে শেরশাহ ১৫৪৪ খ্রি. কালিঞ্জর দুর্গ অধিকারের জন্যে অভিযান করেন। দুর্গ অবরোধকালে একটি গোলা দুর্গের দরজায় আঘাত পেয়ে প্রতিহত হয়ে শেরশাহকে আঘাত করে। এই গোলার আঘাতে শেরশাহ ১৫৪৫ খ্রিঃ ২২ মে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু মৃত্যুর সময় কাশ্মির, গুজরাট, আসাম ছাড়া সমগ্র উত্তর ভারত তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর সাম্রাজ্য পশ্চিমে সিন্ধু থেকে উত্তর-পশ্চিমে গোক্কর দেশ, উত্তরে হিমালয় থেকে পূর্বে আসাম এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

শেরশাহের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা

শেরশাহ মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যে সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রতিভার সমন্বয়ে তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থেকেও নব-প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের শান্তি রক্ষা ও সুশাসনের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। শেরশাহ আলাউদ্দিন খলজীর শাসনপদ্ধতির কিছু মূলনীতি অনুসরণ করেছিলেন। তবে অধিকাংশ ছিল তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবন।তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের হিন্দু-মুসলিম শাসন পদ্ধতির কিছু কিছু মৌলিক নীতি গ্রহণপূর্বক স্বীয় প্রতিভার দ্বারা সেগুলোকে আধুনিক রূপদান করেছিলেন। বৃটিশ ঐতিহাসিক কিনি শেরশাহের শাসন পদ্ধতির মূল্যায়ন করতে গিয়ে মন্তব্য করেন যে, কোন শাসকই এমনকি বৃটিশ সরকারও শাসনকার্যে শেরশাহের ন্যায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করেননি।

মধ্যযুগে সর্বত্র শাসকের ক্ষমতা ছিল অবাধ। সে হিসেবে শেরশাহও অবশ্যই নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তবে তিনি স্বৈরাচারী ছিলেন না। নিজ হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত রেখেও প্রদেশে কর্মচারীদের তত্ত্বাবধান করতেন। জনকল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর শাসন ব্যবস্থার মূলনীতি। অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে যে কয়জন রাজা অবাধ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে প্রজার কল্যাণে কাজ করেছেন তাঁদের সাথে ষোড়শ শতকে ভারতের শাসক শেরশাহের তুলনা করা চলে।

বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা

শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে শেরশাহ তাঁর সাম্রাজ্যকে ৪৭টি সরকারে বা অঞ্চলে ভাগ করেছিলেন। আবার প্রত্যেক সরকারকে কয়েকটি পরগণায় ভাগ করেন। প্রত্যেকটি পরগণায় একজন করে শিকদার, আমীন, মুনসীফ, খাজাঞ্চী বা কোষাধ্যক্ষ, দু'জন 'কারকুন' (হিসাব লেখক, একজন হিন্দু ও একজন মুসলিম) থাকতেন। পরগণার সামরিক অধিকর্তা হলেন শিকদার।কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ-নির্দেশ কার্যকরী করা, প্রয়োজনের সময় আমীনকে সামরিক সহায়তা প্রদান করা ছিল তাঁর কর্তব্য। আমীন ছিলেন সর্বোচ্চ বেসামরিক কর্মকর্তা। পরগণার রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় করাই ছিল তাঁর কর্তব্য।

প্রত্যেকটি সরকারের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন শিকদার-ই-শিকদারান এবং মুন্সীফ-ই-মুনসীফান। মুনসীফ-ই-মুনসীফান সাধারণত দিওয়ানী মামলার বিচার করতেন এবং শিকদার-ই-শিকদারান সরকারের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত থাকতেন। শেরশাহ ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত শাসন ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন এবং যাতে কোন রাজকর্মচারী স্থানীয় প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে না পারে সেজন্য প্রতি তিন বৎসর পর পর নিয়মিতভাবে তাদের বদলির ব্যবস্থা করেছিলেন।

রাজস্ব ব্যবস্থা

শেরশাহের শাসন ব্যবস্থার অন্যতম উজ্জ্বল দিক ছিল তাঁর রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার। তাঁর রাজস্ব ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল যাতে রাজকোষ বঞ্চিত না হয় এবং প্রজারাও অযথা উৎপীড়িত না হয়। পূর্বে রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণের জন্যে জমি জরিপের কোন ব্যবস্থা ছিল না। শেরশাহ রাজস্বের হার নির্ধারণের জন্যে সাম্রাজ্যের সমগ্র জমির নির্ভুল জরিপের ব্যবস্থা করেন। উর্বরতা অনুসারে জমিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। গড় উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ দেয় রাজস্বরূপে নির্ধারিত হয়েছিল। কর নির্ধারণের জন্যে তিন রকম ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল: (১) গাল্লা-বক্স বা বাতাই, (২) নস্ক বা মুকতাই বা কানকুট, (৩) নক্দি বা জাব্তি জমাই। উৎপন্ন শস্যে অথবা নগদ অর্থে কর দেওয়া যেত। তিনি কর নির্ধারণে উদার নীতি গ্রহণ করলেও আদায়ের ক্ষেত্রে কোন ঔদার্যের পক্ষপাতি ছিলেন না। রাজস্ব আদায়ের জন্যে মুকাদ্দম, চৌধুরী, পাটোয়ারী প্রভৃতি কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়েছিল। রাজস্ব আদায়কালে যেন অহেতুক অত্যাচার, উৎপীড়ন করা না হয় সে ব্যাপারে উক্ত রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের সতর্ক করে দেয়া হতো। শেরশাহ জমির ওপর প্রজাদের অধিকার নির্ধারণের জন্যে 'কবুলিয়ত' এবং 'পাট্টা' প্রথার প্রবর্তন করেন। সম্রাটের কি প্রাপ্য তা স্বীকার করে প্রজাকে দিতে হতো লিখিত 'কবুলিয়ত'। আর জমিতে প্রজার অধিকার স্বীকার করে প্রজাকে সম্রাট দিতেন 'পাট্টা'। সম্রাট ও প্রজার পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য সুরক্ষার জন্যে 'কবুলিয়ত' ও 'পাট্টা' নামক দু'টি দলিল আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করে শেরশাহ প্রকৃতই আধুনিক রাজস্ব ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেছিলেন।

শুল্ক ও মুদ্রানীতি

ভূমি রাজস্ব সংস্কারের পরই মুদ্রা ও শুল্ক সংস্কার শেরশাহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্যে তিনি আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক আদায়ের রীতি তুলে দিয়ে কেবলমাত্র সীমান্তে অথবা বিক্রয়ের স্থলে উক্ত শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা করেন। এতে ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট সুবিধা হয়। এরফলে যেখানে সেখানে সমগ্র দেশব্যাপী ব্যবসায়ীদের ওপর শুল্ক আদায়ের জুলুম বন্ধ হয়ে যায়।

শেরশাহ মুদ্রা ব্যবস্থারও সংস্কার সাধন করেন। তিনি তাঁর মুদ্রার উপাদানে নির্ভেজাল, ওজনে সঠিক ও গঠনরীতিতে মনোরম ইত্যাদি বিষয়ের ওপর প্রভুত গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি চতুষ্কোণ ও গোলাকার দু'ধরনের মুদ্রা চালু করেন। তিনি সোনা, রূপা ও তামার পৃথক মুদ্রা চালু করেন। তামার মুদ্রাকে বলা হতো দাম। এছাড়া আনি, দু'আনি, সিকি, আধুলি স্তরের মুদ্রাও প্রচলন করেছিলেন। এসঙ্গে মুদ্রার নকসার উন্নতি সাধন করেন। তাঁর এই মুদ্রানীতির সংস্কারের ফলে সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে লেনদেনের

অসুবিধা দূর হয়। তাঁর মুদ্রা পদ্ধতি মুঘল ও কোম্পানি আমলেও বজায় ছিল। প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল ব্রিটিশ মুদ্রার ভিত্তি।

শেরশাহের বিচার ব্যবস্থা

শেরশাহের বিচার ব্যবস্থা তাঁর উন্নত শাসন পদ্ধতির আর একটি উজ্জ্বল দিক। তিনি বিচার ব্যবস্থায় নিরপেক্ষতার নীতি প্রবর্তন করেছিলেন। বংশ কৌলিন্য ও সামাজিক মর্যাদার কোন গুরুত্বই বিচার ব্যবস্থায় দেয়া হতো না। অপরাধীকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হতো। এক্ষেত্রে শেরশাহের নিকটাত্মীয় হলেও রেহাই পেতেন না। প্রতি পরগণার দিওয়ানি বিচার কার্য পরিচালনা করতেন একজন আমিন। ফৌজদারী বিচারের ভার ছিল কাজী ও মীর আদলের ওপর। কয়েকটি পরগণার ওপর একজন করে মুনসীফ-ই-মুনসীফান দেওয়ানি বিচারের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন এবং কাজী-উল-কুজ্জাত বা প্রধান কাজী ছিলেন ফৌজদারী বিচারের ভারপ্রাপ্ত। বিচার ব্যবস্থায় স্বয়ং সম্রাট ছিলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। শেরশাহের দন্ডবিধি ছিল অত্যন্ত কঠোর। অপরাধ প্রমাণিত হলে অপরাধীকে কঠোর দন্ড ভোগ করতে হতো। এমনকি চুরি ডাকাতির অপরাধে প্রাণদন্ড দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এরূপ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যাতে অপরাধ প্রবণতা কমে যায়। বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের ওপর সম্রাট সদা সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। কর্তব্যে অবহেলার জন্যে তাদের শাস্তি ভোগ করতে হতো।

সামরিক ব্যবস্থা

শেরশাহের সামরিক পদ্ধতি আলাউদ্দিন খলজীর সামরিক সংগঠনের অনুকরণে গঠিত ছিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সেনানিবাস স্থাপন করে সৈন্য মোতায়েন রাখার রীতি শেরশাহ গ্রহণ করেছিলেন। দিল্লি ও রোটাসের সেনানিবাস ছিল সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সেনানিবাস। সেনানিবাসে সামরিক ফৌজদারের অধীন 'ফৌজ' অবস্থান করতো। সৈন্যবাহিনী প্রধানত তাঁর অধীনেই থাকতো। তাঁর নিজস্ব সৈন্যের মধ্যে দেড় লক্ষ অশ্বারোহী, পঁচিশ হাজার পদাতিক এবং পাঁচ হাজার হাতি ও গোলন্দাজ ছিল। তাঁর সেনাবাহিনীর বেতন কোন সামরিক অফিসারের মাধ্যমে না দিয়ে প্রতিটি সৈনিককে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে নিতে হতো। সিপাহিদের বেতন নির্দিষ্ট ছিল। শেরশাহ তাঁর সেনাবাহিনীতে দু'টি বিশেষ পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন– (১) দাগ বা অশ্ব চিহ্নিতকরণ, (২) চেরা বা সৈন্যদের বিবরণমূলক তালিকা রাখা। সামরিক বিভাগে কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা রক্ষার ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হতো। যুদ্ধের সময় অথবা সেনাবাহিনীর যাতায়তের ফলে কৃষকদের ফসলের কোন ক্ষতি সাধিত হলে শেরশাহ সেই ক্ষতি পূরণ করে দিতেন।

পুলিশী ব্যবস্থা ও গুপ্তচর প্রথা

অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে শেরশাহ পুলিশী ব্যবস্থার প্রভুত উন্নতি সাধন করেন। দেশের নিরাপত্তার জন্যে তিনি আঞ্চলিক শাসকদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। গ্রামের প্রধান নিজ এলাকার অপরাধীকে ধরিয়ে দিতে বাধ্য ছিলেন। শেরশাহের পুলিশী ব্যবস্থা সম্পর্কে ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "শেরশাহের পুলিশী ব্যবস্থা সনাতনী হলেও উন্নত ধরনের ও শক্তিশালী ছিল।" সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের সংবাদ সংগ্রহের জন্যে শেরশাহ গুপ্তচর প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। গুপ্তচরদের মাধ্যমে তিনি সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার কথা জানতে পারতেন। এসব ব্যবস্থার ফলে সাম্রাজ্যে শান্তি অক্ষুন্ন ছিল এবং অপরাধ কমে গিয়েছিল।সমসাময়িক ঐতিহাসিক নিজামউদ্দিন মন্তব্য করেন, "রাস্তাঘাটে কেউ যদি সোনার থলি নিয়েও ঘুমিয়ে পড়ত, তাতে চুরি যাওয়ার কোন ভয় ছিল না।"

জনহিতকর কার্যাবলি

সাম্রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্যে শেরশাহ বহু সুন্দর ও সুদীর্ঘ রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে প্রধান হলো সোনারগাঁ থেকে আগ্রা হয়ে দিল্লি এবং পাঞ্জাব হয়ে সিন্ধু পর্যন্ত রাজপথটি। এটি গ্র্যান্ড রোড নামে পরিচিত। দ্বিতীয়টি ছিল আগ্রা, যোধপুর এবং চিতোর পর্যন্ত। তৃতীয়টি ছিল আগ্রা থেকে বরহানপুর এবং চতুর্থটি ছিল লাহোর থেকে মুলতান পর্যন্ত। প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শ অনুযায়ী পথের দুধারে তিনি বৃক্ষ রোপন ও সরাইখানা স্থাপন করেছিলেন। তিনি প্রায় ১৭০০টি সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন। এই সরাইখানাগুলো ডাক-চৌকির কাজ করতো। অর্থাৎ এগুলো চিঠিপত্র আদান প্রদানের কেন্দ্র ছিল এবং আঞ্চলিক থানার কাজ করতো। এই দপ্তরগুলো যাদের হাতে ছিল তাদের দারোগা-ই-ডাকচৌকি বলা হতো। সরাইখানাগুলো পথিকের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সরাইখানাগুলোতে হিন্দু-মুসলমানদের থাকার পৃথক বন্দোবস্ত ছিল। এসব সরাইখানার ব্যয় সরকার প্রদত্ত জমির আয় থেকে নির্বাহ করা হতো।

ধর্মীয় নীতি

ধর্মের ব্যাপারে শেরশাহ যুগধর্মকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। তিনি নিজে নিষ্ঠাবান মুসলমান হলেও প্রজাদের ধর্মের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সহিষ্ণু। নিজের ব্যক্তিগত ধর্মকে কখনও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেননি। জৌনপুরে শিক্ষা গ্রহণ এবং হানাফী মতবাদে বিশ্বাসী শেরশাহ ধর্মীয় ক্ষেত্রে উদার মানসিকতার পরিচয় দেন। দূরদর্শী রাজনীতিকের মতো সমস্ত প্রজাকে তিনি সমান দৃষ্টিতে দেখতেন। রাষ্ট্রীয় কার্যে হিন্দু ও মুসলমানকে তিনি কখনও ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করেননি। প্রজাদের ভাগ করেছিলেন যোগ্যতা ও অযোগ্যতার ভিত্তিতে। তিনি প্রজাদের যোগ্যতার মানদন্ডে বিচার করে রাষ্ট্রীয় কার্যে নিয়োগ দিতেন। ব্রহ্মজিৎ গৌড় নামক জনৈক হিন্দুকে তাঁর অন্যতম প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দান করেছিলেন। অবশ্য হিন্দুদের 'জিজিয়া কর' তিনি রহিত করেননি। তবে 'জিজিয়া কর' ধর্মীয় কর হিসেবে আদায় করতেন না। আকবরের মতো মনের বিশালতা সম্ভবত তাঁর ছিল না, অথবা হয়তো জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সে বৈশিষ্ট্য অর্জনের সময় ও সুযোগ তিনি পাননি।

শেরশাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব

শেরশাহের মতো বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, অসামান্য সমরকুশলী, সুদক্ষ এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শাসক ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে খুবই বিরল। সাসারামের এক জায়গীরদারের অবহেলিত পুত্র হিসেবে জীবন আরম্ভ করেন এবং মুঘলদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। নেপোলিয়নের মতো সামান্য সৈনিক হিসেবে জীবন শুরু করে ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হন এবং এক নতুন সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেন। নেপোলিয়নের মতোই সেই সাম্রাজ্যের সংস্কার সাধন করে জনসাধারণের কৃতজ্ঞভাজন হয়েছিলেন। 'জিজিয়া কর' প্রত্যাহার না করা, রাইসিন দুর্গ দখলের সময় ও রাজপুতদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের সময় জেহাদ ঘোষণা করাকে অনেকে তাঁর ধর্মান্ধতার দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু মধ্যযুগের বাতাবরণে বিচার করলে এমন বুদ্ধিমান, তেজস্বী, পরিশ্রমী এবং দূরদৃষ্টি ও শাসন সংস্কার করার প্রতিভাসম্পন্ন এই নৃপতির গুণাবলি এতো মহান যে, সামান্য দোষও তাতে চাপা পড়ে যায়। মুসলিম রাজত্বকালে আলাউদ্দিন খলজী, মুহাম্মদ বিন তুঘলক এবং আকবরের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের ইতিহাসে একমাত্র শেরশাহই ইতিহাসের পাতায় এক উজ্জ্বল তারকা।

শেরশাহ ছিলেন মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে অন্যতম একজন সুদক্ষ প্রশাসক। নরপতির কর্তব্য সম্পর্কে তিনি পূর্ণ সচেতন ছিলেন। রাষ্ট্র ও প্রজার কল্যাণই শাসকদের কর্তব্য, তা তিনি বিস্মৃত হননি। শেরশাহের সাম্রাজ্য ছিল জনসাধারণের কল্যাণ করার ইচ্ছার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই আরস্কিন শেরশাহকে

'জনসাধারণের অভিভাবক' হিসেবে দেখেছেন। শেরশাহ আলাউদ্দিন খলজী ও মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মতো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। শাসনকার্যে দুর্নীতি ও অবিচার তিনি মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। অপরাধী কর্মচারীকে তিনি কঠোর শাস্তি দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। কেউ শস্যহানি করলে তিনি কঠোর শাস্তি দিতেন। দরিদ্র ও অনাথদের জন্যে তাঁর সহানুভূতির অন্ত ছিল না। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনে তিনি রাইসিন ও রোটাস দুর্গ অধিকারের সময় কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন সত্য; কিন্তু তিনি স্বভাবনিষ্ঠুর ছিলেন না। দয়া ও কোমলতা ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

সৈনিক হিসেবে তিনি ছিলেন অনন্য প্রতিভার অধিকারী। তিনি শুধু একজন যোদ্ধাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সুচতুর সামরিক পরিকল্পনাকারী। যেরূপ চাতুর্যের সঙ্গে হুমায়ুনকে মোকাবিলা করেছিলেন, তা তাঁর উচ্চস্তরের কূটনীতি হিসেবে বিবেচিত। হুমায়ুনের ভুলগুলোকে কাজে লাগিয়ে তিনি চূড়ান্তভাবে সফল হন। আফগান জাতি যখন ছত্রভঙ্গ তখন তিনি তাদের সমবেত করে এক রাষ্ট্রীয় ঐক্যের দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। আফগান জাতীয়তাবোধের তিনিই স্রষ্টা।

শেরশাহ জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্যে শিল্প-বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। এজন্যে তিনি আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক বাতিল করে এবং রাস্তাঘাট নির্মাণ করে আধুনিক অর্থনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দেন। ঘোড়ার পিঠে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা, পুলিশী ব্যবস্থার সংগঠন, সামরিক বাহিনীর উন্নতি বিধান, বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করে শেরশাহ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

যদিও তিনি সুশিক্ষিত এবং আরবি ও ফারসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন, তথাপি তিনি নিজেকে একজন বিদ্বান ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি বিদ্বানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কিন্তু তাঁর রাজদরবারে দিল্লির সুলতানি আমলের রাজদরবারের মতো কোন পন্ডিতই কোন বিষয়ে তেমন গুরুত্বপূর্ণ রচনার স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেননি। অবশ্য এই দৈন্যতা তিনি পূরণ করেছিলেন তাঁর অনবদ্য স্থাপত্য শিল্পের মাধ্যমে। শেরশাহ তাঁর ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ স্বল্প সময়ের শাসনকালেও স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রেখে গেছেন। দিল্লিতে নির্মিত তাঁর 'পুরান-কিল্লা' ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শন। এছাড়া তাঁর স্থাপত্য শিল্পের অন্য একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সাসারামে তাঁর নিজের জন্য তৈরি সমাধিভবন। হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয়ের এই নিদর্শনটিকে কানিংহাম শিল্প-সুষমার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। পার্শী ব্রাউনও শেরশাহের স্থাপত্য শিল্পের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

শেরশাহ ছিলেন একজন ধর্মনিরপেক্ষ শাসক। স্বয়ং ধর্মপরায়ণ মুসলমান হয়েও তিনি শাসনকার্যে কোনরূপ ধর্মান্ধতা প্রদর্শন করেননি। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের সৌহার্দ ও সম্প্রীতিই ছিল তাঁর ধর্মনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এভাবে সমস্ত দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রজাদের প্রতি দাক্ষিণ্য, কৃষকদের প্রতি যত্ন, উদার দৃষ্টিভঙ্গি, ন্যায়বিচার, কঠোর পরিশ্রম, নিজের সুখ ও বিশ্রাম বিসর্জন দিয়ে কর্তব্য পরায়ণতা এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিভা প্রভৃতি গুণাবলির জন্যে মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসে মহান আকবরের পরই শেরশাহ এক গৌরবময় আসন অধিকার করে আছেন। এজন্য আধুনিক ঐতিহাসিকগণ আফগান জাতির শ্রেষ্ঠ প্রতিভা শেরশাহের সঙ্গে মুঘল সম্রাট আকবরের সাদৃশ্য খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তাই ঐতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, "ইতিহাসে শেরশাহ একটি উচ্চ স্থান লাভের যোগ্য। রাজনৈতিক সংস্কার এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতা নীতির প্রবর্তন দ্বারা তিনি অজ্ঞাতসারে আকবরের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন"

সারসংক্ষেপ

সাসারামের একজন্য সামান্য জায়গীরদার থেকে শেরশাহ দিল্লির বাদশাহ হন। তিনি তাঁর সামরিক দক্ষতা ও রণকৌশলের মাধ্যমে প্রথমে বিহার পরে বাংলা অধিকার করেন। পরবর্তীকালে কনৌজ বা বিলগ্রামের যুদ্ধে (১৫৪০ খ্রি.) হুমায়ুনকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে উত্তর ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লির সিংহাসনে শূর-আফগান বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। অতপর তিনি রনথম্ভোর, মালব, কালিঞ্জর প্রভৃতি অধিকার করে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটান। এবং শাসনকার্যে মনোনিবেশ করে সাম্রাজ্যের প্রভুত উন্নতি সাধন করেন। তাঁর শাসনকালের অন্যতম অবদান ছিল সাম্রাজ্যকে শাসনের সুবিধার জন্যে সরকার ও পরগনায় বিভক্তি, রাজস্ব সংস্কার, শুল্ক ও মুদ্রানীতির সংস্কার, সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন, সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠন ইত্যাদি।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India,* Allahabad, 1970.
২. আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*, ঢাকা, ১৯৮৮।
৩. এ.কে.এম. আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৭৩।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শেরশাহের বাল্যনাম কি ছিল?
(ক) সেলিম (খ) ফরিদ
(গ) হাসান (ঘ) ফরিদুল।

২। শেরশাহ বিহারের কোন নাবালক শাসকের অভিভাবক নিযুক্ত হয়েছিলেন?
(ক) জালাল খাঁর (খ) জামাল খাঁর
(গ) দারিয়া খাঁর (ঘ) বাহার খাঁর।

৩। বাংলার শাসক মাহমুদ শাহ শের খাঁকে সন্ধির শর্তানুসারে কত স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলেন?
(ক) পাঁচ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা (খ) বার লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা
(গ) তের লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা (ঘ) পনর লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা।

৪। কবুলিয়ত ও পাট্টা প্রথার প্রবর্তন কে করেছিলেন?
(ক) বাবুর (খ) হুমায়ুন
(গ) শেরশাহ (ঘ) আকবর।

৫। শেরশাহ তাঁর সমগ্র সাম্রাজ্যকে কয়টি সরকারে বিভক্ত করেছিলেন?
(ক) ৫৭টি (খ) ৪৭টি
(গ) ৬৭টি (ঘ) ২৭টি।

৬। পরগণার দিওয়ানি বিচার কে পরিচালনা করতেন?
(ক) আমীন (খ) মীর আদল
(গ) মুনসীফ-ই-মুনসীফান (ঘ) কাজী-উল-কুজ্জাত।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। শেরশাহ বাংলা অধিকারের পর যে নতুন প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন তার একটি বিবরণ দিন।
২। শেরশাহের বেসামরিক শাসনব্যবস্থার বিবরণ দিন।
৩। শেরশাহের জনহিতকর কার্যাবলী ও ধর্মনীতি বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। সাসারামের জায়গীরদার থেকে কিভাবে শেরশাহ দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন তার একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করুন।
২। শেরশাহের শাসন সংস্কারের বর্ণনা দিন।
৩। শেরশাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।

পাঠ - ২

বাংলায় আফগান শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *বাংলায় শূর আফগানদের শাসন সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *বাংলায় কররানী আফগানদের শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *কররানী আফগানদের অন্যতম শাসক সুলেমান কররানীর রাজত্বের বিবরণ দিতে পারবেন;*
- *কররানী শাসক দাউদ কররানীর শাসনকাল সম্বন্ধে জানতে পারবেন;*
- *মুঘলদের বাংলা অধিকারের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।*

হুমায়ুনের বিরুদ্ধে শেরশাহ চৌসার যুদ্ধে (১৫৩৯ খ্রি.) জয়লাভ করে বাংলার দিকে যাত্রা করেন এবং অবিলম্বে গৌড় পুনরুদ্ধার করেন। গৌড়ে তিনি বৎসরকাল অবস্থান শেষে বাংলার শাসন ব্যবস্থা সুসংগঠিত করে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং হুমায়ুনকে কনৌজের যুদ্ধে (১৫৪০ খ্রি.) পরাজিত করে ভারতবর্ষ ত্যাগে বাধ্য করেন (এসব যুদ্ধের বিবরণ পূর্ববর্তী পাঠে দেয়া হয়েছে)। অতপর শেরশাহ উত্তর ভারতের সম্রাট হলেন এবং গৌড় থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন সেই সঙ্গে খিজির খান নামক জনৈক কর্মকর্তাকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

খিজির খান

শেরশাহ দিল্লিতে প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকার সুযোগে খিজির খান এক প্রকার স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করছিলেন। ১৫৪১ খ্রি. তিনি গৌড়ের শেষ সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের এক কন্যাকে বিবাহ করে স্বাধীন সুলতানের মত শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন। খিজির খানের এসব কার্যকলাপের সংবাদ পেয়ে শেরশাহ তড়িৎ গতিতে পাঞ্জাব হতে বাংলায় আসেন। তিনি খিজির খানকে পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে কাজী ফজীলতকে বাংলার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

কাজী ফজীলত

কাজী ফজীলতের শাসন আমলে শেরশাহ বাংলার শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধন করেন। এই পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলায় প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ বন্ধ করা। নতুন শাসন ব্যবস্থায় বাংলাকে অনেকগুলো প্রশাসনিক অঞ্চলে (সরকার) বিভক্ত করে প্রত্যেক অঞ্চলে একজন করে শাসনকর্তা (আমীর) নিয়োগ করেছিলেন। এই সময় শেরশাহ যাতায়াতের সুবিধার জন্য সোনারগাঁও হতে সিন্ধু পর্যন্ত একটি রাজপথ নির্মাণ করেন। যা ব্রিটিশ যুগে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে পরিচিত হয়।

ইসলাম শাহের আমলে বাংলা

শেরশাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জালাল খান শূর ইসলাম শাহ নাম ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি আট বৎসর (১৫৪৫-৫৩ খ্রি.) রাজত্ব করেন। তাঁর শাসনামলে কালিদাস গজদানী নামক একজন

রাজপুত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সুলেমান খান নাম ধারণ করেন। তিনি বাংলায় এসে পূর্ববঙ্গের অংশবিশেষ অধিকার করে সেখানকার স্বাধীন শাসকরূপে আসীন হন। ইসলাম খান তাঁকে দমন করবার জন্য তাজ খান এবং দরিয়া খান নামক দু'জন সেনানায়ককে পাঠান। যুদ্ধের মাধ্যমে তাঁরা সুলেমান খানকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। কিন্তু অল্পকাল পরে সুলেমান বিদ্রোহ করলে ইসলাম খান পুনরায় তাজ খান ও দরিয়া খানকে সসৈন্যে তাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তাঁরা সুলেমান খানকে সাক্ষাৎকারে আহ্বান করে বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে তাঁকে হত্যা করেন। অতপর সুলেমান খানের দুইপুত্রকে তুরানি ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দেন।

মুহাম্মদ আদিল শাহ এবং পরবর্তী শূর আফগানদের শাসনে বাংলা

ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর ১২ বৎসরের পুত্র ফিরোজ শাহ দিল্লির সিংহাসনে বসেন। কিন্তু মাত্র কয়েকদিন রাজত্ব করার পর শেরশাহের ভ্রাতুস্পুত্র মুবারিজ খান তাঁকে হত্যা করে মুহাম্মদ আদিল শাহ নাম ধারণ করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারে আফগান দলপতিদের অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং আফগানদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। অনেক প্রাদেশিক শাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

শামসউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ (১৫৫৩-১৫৫৫ খ্রি.)

ইসলাম শাহের মৃত্যুর সময়ে (১৫৫৩ খ্রি.) বাংলার আফগান শাসনকর্তা ছিলেন মুহাম্মদ খান। দিল্লিতে আফগানদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগে মুহাম্মদ খান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি শামসউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ গাজী উপাধি ধারণ করে বাংলার স্বাধীন সুলতান রূপে অধিষ্ঠিত হন। শামসউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে একদিকে আরাকানের ওপর হামলা করেন, অপরদিকে জৌনপুর অধিকার করে আগ্রা ও দিল্লির অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি বেশিদূর অগ্রসর হতে পরেননি। মুহাম্মদ আদিল শাহের হিন্দু সেনাপতি তাঁকে ছাপরঘাট নামক স্থানে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন (ডিসেম্বর, ১৫৫৬ খ্রি.)।

প্রথম গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর (১৫৫৬–৬০খ্রি.)

শামসউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ পরাজিত ও নিহত হবার পর দিল্লির বাদশাহ মুহাম্মদ আদিল শাহ শাহবাজ খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু শামসউদ্দিন শাহের পুত্র খিজির খান এলাহাবাদে অবস্থানকালে পিতার মৃত্যু সংবাদ অবগত হয়ে নিজেকে বাংলার স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন এবং গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর নাম ধারণ করেন। অতপর শীঘ্রই তিনি বাংলা আক্রমণ করে শাহবাজ খানকে পরাজিত করে বাংলার অধিপতি হন (১৫৫৬ খ্রি.)।

এ সময়ে দিল্লির রাজনৈতিক পরিস্থিতি সংকটজনক হয়ে ওঠে। বিতাড়িত মুঘল সম্রাট হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন। হুমায়ুন আফগান সুলতান সিকান্দার শাহ শূরকে পরাজিত করে দিল্লি পুনরুদ্ধার করেন। কিছুদিন পরেই হুমায়ুন মৃত্যুবরণ করেন (২৬ জানুয়ারি, ১৫৫৬ খ্রি.)। অতপর হুমায়ুনের পুত্র আকবর ও তাঁর অভিভাবক বৈরাম খান মুহাম্মদ আদিল শাহের সেনাপতি হিমুকে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬ খ্রি.) পরাজিত ও নিহত করলে আদিল শাহ বাংলার দিকে পালিয়ে যান। পথিমধ্যে সুরজগড়ের নিকটবর্তী ফতেপুরে বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ তাঁকে আক্রমণ করে পরাজিত ও নিহত করেন (১৫৫৭ খ্রি.)। অতপর সুলতান গিয়াসউদ্দিন জৌনপুর অভিমুখে যাত্রা করেন, কিন্তু অযোধ্যার নিকট মুঘল সেনাপতি খান-ই-জাহান তাঁর গতিরোধ করেন। কুটকৌশলী গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর মুঘল সেনাপতি খান-ই-জাহানের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে বাংলায় ফিরে আসেন। এবং ১৫৬০ খ্রি. পর্যন্ত বাংলা শাসন করে মৃত্যুবরণ করেন।

দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দিন জালাল শাহ (১৫৬০–১৫৬৩ খ্রি.)

গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তদ্বীয় ভ্রাতা জালালউদ্দিন দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দিন নাম ধারণ করে বাংলার সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হন (১৫৬০ খ্রি.)। তিনিও তার ভ্রাতার ন্যায় মুঘলদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু এ সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের অনেকখানি অংশ কররানী বংশীয় আফগানরা অধিকার করে নেয়। ফলে রাজ্য শাসনে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ১৫৬৩ খ্রি. তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তৃতীয় গিয়াসউদ্দিন (১৫৬০–৬৪ খ্রি.)

দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এই পুত্রের নাম জানা যায় না। তিনি মাত্র কয়েক মাস রাজত্ব করার পর তৃতীয় গিয়াসউদ্দিন নামে জনৈক আফগান দলনেতা তাঁকে হত্যা করে বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন। তিনিও বেশিদিন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেননি। এক বৎসর পর কররানী বংশীয় তাজ খান কররানী তৃতীয় গিয়াসউদ্দিনকে হত্যা করে বাংলার অধিপতি হন। এভাবে বাংলায় আফগান শূর বংশের শাসনের অবসান ঘটে এবং তদস্থলে আফগান কররানী বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

কররানী আফগান শাসনে বাংলা

তাজ খান কররানী

কররানী উপাধিধারী আফগানরা ছিল আফগান বা পাঠান জাতির একটি প্রধান গোত্রের লোক। তাদের আদি নিবাস ছিল বঙ্গাশে (আধুনিক কুররম)। শেরশাহের প্রধান অমাত্যবর্গ ও কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কররানী বংশের লোক। এদের মধ্যে তাজ খান অন্যতম। তাজ খান শেরশাহের সঙ্গে বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এবং রাজদরবারে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। মুহাম্মদ আদিল শাহ দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার পর তাজ খান রাজধানী থেকে পালিয়ে যান। বর্তমান উত্তর প্রদেশের গাঙ্গেয় অঞ্চলের একাংশ তিনি অধিকার করে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। কিন্তু মুহাম্মদ আদিল শাহ তাঁকে পশ্চাদ্ধাবন করে ছিব্রাঘাউয়ের (বর্তমান ফরাক্কাবাদের ১৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত) যুদ্ধে পরাজিত করেন। পরাজিত হয়ে তাজ খান খাওয়াসপুর তান্ডায় পালিয়ে গিয়ে সেখানকার জায়গীরদার তদ্বীয় ভ্রাতা ইমাম, সুলেমান এবং ইলিয়াসের সঙ্গে মিলিত হন। অতপর চার ভ্রাতা জনসাধারণের নিকট হতে রাজস্ব আদায় করতে থাকেন। এসঙ্গে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রামগুলো লুটপাট করে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করেন। তাঁরা মুহাম্মদ আদিল শাহ-এর একশত হাতি অধিকার করে নেন। অনেক বিদ্রোহী আফগান তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। কিন্তু মুহাম্মদ আদিল শাহের সেনাপতি হিমু চুনারের নিকট তাঁদেরকে পরাজিত করেন (১৫৫৪ খ্রি.)। এ অবস্থায় তাজ খান ও ভ্রাতা সুলেমান বাংলায় পালিয়ে আসেন এবং সুযোগ বুঝে দক্ষিণ-পূর্ব বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের অনেকাংশ অধিকার করে আধিপত্য বিস্তার করেন। বাংলার পশ্চিম সীমান্তে তাজ খানের আধিপত্যে বাংলার সুলতান তৃতীয় গিয়াসউদ্দিন বিচলিত হন। তাঁকে সন্তুষ্ট রাখার উদ্দেশ্যে সুলতান তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। অভ্যর্থনার সুযোগে তাজ খান তৃতীয় গিয়াসউদ্দনকে হত্যা করে নিজে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন (১৫৬৪ খ্রি.)। সিংহাসনে আরোহণ করে তাজ খান বিদ্রোহী কোকারদের কঠোরভাবে দমন করেন। তবে পাঠানদের অপর একটি গোত্র তাজ খানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে তাঁকে পরাজিত করেন। এই মনোবেদনায় অল্পকালের মধ্যে তাজ খান কররানী মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৫৬৫ খ্রি.) এবং তদস্থলে ভ্রাতা সুলেমান কররানী বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

সুলেমান কররানী (১৫৬৫–৭২ খ্রি.)

সুলেমান কররানী একজন দক্ষ ও শক্তিশালী শাসক এবং বিজেতা ছিলেন। তিনি তাঁর রাজ্য সীমানা ক্রমশ দক্ষিণে পুরী, পশ্চিমে শোন নদ, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। দিল্লি, অযোধ্যা, গোয়ালিয়র, এলাহাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল মুঘলদের পদানত হলে হতাবশিষ্ট বহু সামরিক-বেসামরিক আফগান দলপতি বাংলায় সুলেমান কররানীর আশ্রয়ে আসেন। তাঁদের পেয়ে সুলেমান বিশেষ ক্ষমতাবান হয়ে ওঠেন। গঠন করেন শক্তিশালী সেনাবাহিনী। এসঙ্গে ছিল সহস্রাধিক উৎকৃষ্ট রণহস্তি, যা তাঁকে অপরাজেয় সামরিক শক্তিতে পরিণত করেছিল।

বাংলার অধিপতি হয়ে প্রথমেই তিনি বাংলায় শান্তি স্থাপনে সচেষ্ট হন। এসঙ্গে গৌড় থেকে রাজধানী মালদহের ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত তান্ডায় স্থানান্তরিত করেন। তিনি ছিলেন একজন ন্যায় বিচারক। উলেমা ও দরবেশদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং শরীয়তের বিধান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুলেমান ছিলেন বেশ দূরদর্শী। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, দেশের নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখতে হলে মুঘলদের সঙ্গে মিত্রতা নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। এজন্যে তিনি মুঘল সম্রাট আকবর এবং তাঁর সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশের (অযোধ্যা অঞ্চলের) শাসনকর্তা খান-ই-জামান আলী কুলী খান ও খান-ই-খানান মুনিম খানকে উপহার প্রদান করে সন্তুষ্ট রাখতেন। তবে ভিতরে ভিতরে অনেকবার মুঘল বিরোধীদের সাহায্য করলেও দুই একবার ছাড়া আর কখনও প্রকাশ্যে মুঘলদের বিরোধিতা করেননি। ১৫৬৫ খ্রি. খান-ই-জামান আলী কুলী খান আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সুলেমান কররানীর সহযোগিতা কামনা করেন। এদিকে আকবর হাজী মুহাম্মদ খান সিস্তানী নামে একজন দূত পাঠিয়ে সুলেমান কররানীকে আলী কুলী খানকে সাহায্য না করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সুলেমানের নিকট উক্ত দূত আসার আগেই তিনি আলী কুলী খান কর্তৃক বন্দি হন। ফলে সুলেমান আলী কুলী খানের সঙ্গে যোগদান করে রোটাস দুর্গ জয়ের জন্য এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। দুর্গ জয় যখন আসন্ন তখন সংবাদ এলো যে, আকবরের সৈন্যবাহিনী আসছে। তখনই সুলেমান তাঁর সৈন্যবাহিনী রোটাস দুর্গ থেকে প্রত্যাহার করে নেন। অতপর আলী কুলী খান, হাজী মুহাম্মদ সিস্তানী ও খান-ই-খানান মুনিম খানের মধ্যস্থতায় আকবরের সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হয়। ১৫৬৭ খ্রি. পুনরায় আলী কুলী খান বিদ্রোহী হলে মুঘল সৈনীবাহিনী তাঁকে পরাজিত ও নিহত করে। তখন আলী কুলী খান প্রতিষ্ঠিত জমানীয়া নগরের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আসাদুল্লাহ সুলেমানকে জমানীয়া নগর সমর্পণ করার প্রস্তাব করলে তিনি প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। সেখানে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু ইতোমধ্যে খান-ই-খানান মুনিম খান আসাদুল্লাহকে বশে আনলে সুলেমান সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। সুলেমানের প্রধান উজির লোদি খানের পরামর্শে মুনিম খানের সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হয়। সুলেমান পাটনায় মুনিম খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আকবরের নামে মুদ্রাঙ্কন ও খুৎবা পাঠ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। এই প্রতিশ্রুতি সুলেমান যথারীতি পালন করেছিলেন এবং আর কখনও আকবরের অধীনতা অস্বীকার করেননি।

উড়িষ্যা বিজয়

সুলেমানের আমলে বাংলার প্রতিবেশী হিন্দু রাজ্যে একের পর এক দুর্বল রাজার সিংহাসনে অধিষ্ঠান এবং অমাত্যবর্গের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলে রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। হরিচন্দন মুকুন্দদেব নামে একজন মন্ত্রী খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। চন্দ্রপ্রতাপ দেব ও নরসিংহ জেনা নামক দু'জন রাজা স্বল্পকাল রাজত্ব শেষে নিহত হলে মুকুন্দদেব রঘুরায় জেনা নামে একজন রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসান। কিন্তু ১৫৬০–৬১ খ্রি. মুকুন্দদেব নিজেই উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। ইব্রাহিম শূর নামে মুহাম্মদ আদিল শাহের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী উড়িষ্যায় মুকুন্দদেবের নিকট আশ্রয় নিয়েছিলেন। ১৫৬৫ খ্রি. মুকন্দদেব আকবরের আনুগত্য স্বীকার করেন। এসঙ্গে প্রতিশ্রুতি দেন যে, সুলেমান কররানী যদি আকবরের বিরোধিতা করেন তবে তিনি ইব্রাহিম শূরকে দিয়ে বাংলা আক্রমণ করাবেন। তবে উড়িষ্যা রাজ মুকুন্দদেব নিজে একবার পশ্চিমবঙ্গের সাতগাঁও পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। ১৫৬৭-৬৮ খ্রি. আকবর যখন চিতোর আক্রমণে ব্যস্ত ছিলেন সে সময়ে সুলেমান তাঁর পুত্র বায়েজিদ এবং

ভূতপূর্ব মুঘল সেনাপতি সিকান্দর উজবেকের যৌথ নেতৃত্বে উড়িষ্যায় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। এদের প্রতিরোধে মুকন্দদেব কর্তৃক প্রেরিত ছোট রায় ও রঘুভঞ্জু-এর নেতৃত্বে উড়িষ্যা বাহিনী বিশ্বাসঘাতকতা করে মুকুন্দদেবের বিরোধিতা করে। মুকুন্দদেব কটসামা দুর্গে আশ্রয় নেন এবং অর্থ দ্বারা শত্রু পক্ষের (বায়েজিদদের) একদল সৈন্যকে হাত করে নেন। অতপর মুকুন্দদেবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে মুকুন্দদেব ও ছোট রায় নিহত হন। এতে সুলেমান কররানীর কাজ সহজ হয়। তিনি ইব্রাহিম শূরকে বন্দি করে হত্যা করেন।

পুরী অধিকার

এর পর সুলেমান কররানী পুরী অধিকারের জন্য তাঁর অন্যতম সেনাপতি কালাপাহাড়ের অধীনে একদল অশ্বারোহী প্রেরণ করেন। কালাপাহাড় অতি দ্রুতগতিতে পুরী পৌঁছে প্রায় বিনা বাধায় পুরী অধিকার করে। তাঁরা পুরীস্থ জগন্নাথ মন্দিরে রক্ষিত বিপুল ধনরত্ন অধিকার করে। মন্দিরটি আংশিকভাবে ধ্বংস করে এবং মূর্তিগুলোকে খন্ড-বিখন্ড করে। অনেকগুলো সোনার মূর্তিসহ বেশ কয়েকমণ সোনা তাঁরা হস্তগত করে। অল্পকালের মধ্যেই সমগ্র উড়িষ্যা সুলেমান কররানীর বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রথমবারের মত উড়িষ্যা মুসলমান শাসনের অধীনে আসে।

কোচবিহার আক্রমণ

সুলায়মান কররানীর রাজত্বকালের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো কোচবিহার আক্রমণ। সুলেমান কররানীর রাজত্বকালের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বিশ্বসিংহের নেতৃত্বে কোচবিহারে এক রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিশ্বসিংহ বাংলার সুলতান ও অহোম রাজার সঙ্গে সর্বদা মৈত্রী সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছিলেন। ১৫৪০ খ্রি. বিশ্বসিংহ মৃত্যুবরণ করলে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র নরনারায়ণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি তাঁর পিতার মৈত্রী নীতি অস্বীকার করে ১৫৬৮ খ্রি. বাংলা আক্রমণ করতে কোচবিহারের সেনাপতি শুক্রধ্বজকে প্রেরণ করেন। সুলেমানের বাহিনী কালাপাহাড়ের নেতৃত্বে শুক্রধ্বজকে পরাজিত ও বন্দি করে। অতপর সুলেমানের বাহিনী কোচবিহার আক্রমণ করে সুদূর তেজপুর পর্যন্ত হানা দেয়। কিন্তু কোচবিহার ও কামরূপে স্থায়ী আধিপত্য স্থাপন না করে শুধুমাত্র হাজো, কামাখ্যা ও অন্যান্য স্থানের মন্দিরগুলো ধ্বংসসাধন করে সুলেমানের বাহিনী ফিরে আসে। এর কিছুদিন পর সুলেমান প্রধান উজির লোদি খানের পরামর্শে শুক্রধ্বজকে মুক্তি দেন। কারণ ইতোমধ্যে মুঘল কর্তৃক বাংলা আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে উত্তর সীমান্তে শক্তিশালী বন্ধুত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কোচবিহার রাজকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে মুঘলরা আক্রমণ করলে তাঁর সাহায্য পাওয়া যাবে– এরূপ চিন্তা থেকে হয়তো শুক্রধ্বজকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। যাই হোক সুলেমানের জীবদ্দশায় মুঘলরা বাংলা আক্রমণ করেনি। মাত্র আট বৎসর রাজত্ব শেষে ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দের ১১ অক্টোবর সুলেমান কররানী মৃত্যুবরণ করেন।

বায়েজিদ কররানী (১৫৭২ খ্রি.)

সুলেমান কররানীর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়েজিদ কররানী বাংলার সিংহাসনে বসেন। বায়েজিদের উদ্ধত আচরণ ও কর্কশ ব্যবহারের জন্য রাজ্যের আফগান অমাত্যদের নিকট অপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ফলে একদল অমাত্য তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করে। সুলেমান কররানীর ভাগ্নে ও জামাতা হান্স এদের সঙ্গে যোগদান করে বায়েজিদকে হত্যা করে। কিন্তু তিনি নিজে লোদি খান ও অন্যান্য বিশ্বস্ত অমাত্যদের হস্তে গ্রেফতার হন। পরে তাঁদের হাতেই নিহত হন। বায়েজিদ কররানী মাত্র এক বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁর স্বল্পকালীন রাজত্বের মধ্যেই তিনি আকবরের অধীনতা অস্বীকার করেন এবং নিজের নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা জারী করেন।

দাউদ কররানী (১৫৭২-৭৬ খ্রি.)

বায়েজিদ কররানী নিহত হওয়ার পর অমাত্যবর্গ সুলেমান কররানীর দ্বিতীয় পুত্র দাউদ কররানীকে বাংলার সিংহাসনে বসান। তরুণ দাউদ কররানী ছিলেন অত্যন্ত নির্বোধ, বদমেজাজী এবং নিচু চরিত্রের লোক। তিনি কতলু খান, গুজর কররানী প্রমুখ স্বার্থপর আফগান অমাত্যদের পরামর্শে সুযোগ্য মন্ত্রী লোদি খানের জামাতা (তাজ খানের জামাতা) ইউসুফকে হত্যা করে লোদি খানের বিরাগভাজন হন। এসঙ্গে তিনি বায়েজিদের মত আকবরের অধীনতা অস্বীকার করে নিজ নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা জারি করেন। ফলে আকবরের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এদিকে আফগানদের প্রধান সেনাপতি গুজর খান দাউদ-ভ্রাতা বায়েজিদের পুত্রকে বিহারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। এ সংবাদ পেয়ে দাউদ বিহার নিজের অধীনে আনার জন্য এক বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ লোদি খানকে বিহারে প্রেরণ করেন। অন্যদিকে ইতোমধ্যে বিহার অধিকার করার জন্য আকবর খান-ই-খানান মুনিম খানকে বিহারে পাঠিয়েছিলেন। মুনিম খানের বিহারে আসার সংবাদ পেয়ে লোদি খান ও গুজর খান নিজেদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করে ফেলেন এবং মুনিম খানকে উপঢৌকন দিয়ে তাঁর সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন। লোদি খানের এরূপ কার্যকলাপে দাউদ অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। তিনি একদল সৈন্য নিয়ে নিজেই বিহারে আসেন। এ পরিস্থিতিতে লোদি খান রোটাস দুর্গে পালিয়ে গিয়ে মুনিম খানের সাহায্য প্রার্থনা করেন। মুমিন খান তাঁকে মুঘল সৈন্যবাহিনী দিয়ে সহযোগিতা করেন। ইতোমধ্যে মুনিম খানের অনুরোধে আকবর টোডরমলের নেতৃত্বে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। গঙ্গা ও সরযুর সঙ্গমস্থলে উভয় বাহিনী সম্মুখীন হয়। এখানে যুদ্ধে দাউদের সেনাপতি নিজাম খান পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। এ সময়ে কতলু খান লোহানী, গুজর খান এবং শ্রী হরি নামক একজন হিন্দুর পরামর্শে দাউদ খান কররানী ছলনার আশ্রয় নিয়ে লোদি খানকে শিবিরে ডেকে এনে হত্যা করেন। এ হত্যার ফলে আফগানদের মধ্যে ভাঙ্গন চরমে ওঠে। ইতোমধ্যে মুঘল বাহিনী পাটনায় পৌঁছে দাউদের প্রতিরক্ষাব্যুহ অবরোধ করে রাখে। অতপর স্বয়ং আকবর বহু সংখ্যক কামান ও বিশাল রণহস্তিসহ নৌ-বহর নিয়ে বিহারে মুনিম খানের সঙ্গে যোগ দেন (৩ আগস্ট, ১৫৭৪)। আকবর উপলব্ধি করেন, যেহেতু পাটনা দুর্গের সরবরাহ ঘাঁটি হচ্ছে গঙ্গার ওপারে অবস্থিত হাজীপুর দুর্গ; কাজেই হাজীপুর দুর্গ অধিকার করতে পারলে পাটনা দখল সহজ হবে। তাই তিনি হাজীপুর দুর্গ অধিকার করতে এগিয়ে যান। ৬ আগস্ট ১৫৭৪, মাত্র কয়েক ঘন্টার যুদ্ধে হাজীপুর দুর্গ অধিকার করে আগুন লাগিয়ে দেন। এতে দাউদ কররানী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পাটনা দুর্গ থেকে বাংলার রাজধানী তান্ডায় পালিয়ে যান। মুঘল সেনাবাহিনী পাটনার পরিত্যক্ত দুর্গ অধিকার করে নেন এবং বিপুল ধনরত্ন হস্তগত করেন।

পাটনা অধিকারের পর আকবর দিল্লিতে ফিরে যান। কিন্তু মুনিম খান আকবরের নির্দেশে ১৩ আগস্ট, ১৫৭৪ খ্রি. বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাংলা অধিকারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি বিনা বাধায় সুরজগড়, মুঙ্গের, ভাগলপুর, কলহগাও অধিকার করে তেলিয়াগড়ি গিরিপথের পশ্চিমে গুনাহতে উপস্থিত হন। দাউদ কররানীর সেনাবাহিনী এখানে প্রতিরোধ ব্যুহ রচনা করেছিল। কিন্তু মুঘল বাহিনী সকল প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলে বিনা বাধায় বাংলার রাজধানী তান্ডায় প্রবেশ করে। দাউদ খান সাতগাঁও হয়ে উড়িষ্যায় পালিয়ে যান। মুনিম খান তান্ডায় তাঁর সদর দপ্তর স্থাপন করেন। সেখান থেকে আফগানদের বিরুদ্ধে সাতগাঁও, ঘোড়াঘাট (দিনাজপুর), বাকলা (বাকেরগঞ্জ), সোনারগাঁও (ঢাকা) এবং মুহাম্মদাবাদে (যশোর-ফরিদপুর) মুঘল সেনাবাহিনী পাঠান। আফগানরা সকল স্থানে মুঘল বাহিনীর প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে বাংলার সকল অঞ্চলে মুঘলদের আধিপত্য স্থাপিত হয়।

এবার মুঘল সেনাবাহিনী সর্বশক্তি নিয়ে দাউদকে আক্রমণের জন্য উড়িষ্যার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মুঘল বাহিনী বর্ধমান হতে হুগলী জেলার মান্দারণ হয়ে কোলিয়ায় এসে পৌঁছেন। এ সময়ে দাউদ খান হরিপুরে অবস্থান করছিলেন। হরিপুরে তিনি পরিখা খনন ও প্রতিরোধ প্রাচীর নির্মাণ এবং জঙ্গলাকীর্ণ রাস্তায় নানারূপ বাধার সৃষ্টি করে মুঘল বাহিনীর গতিরোধ করতে প্রস্তুত হন। দাউদ খানের এই প্রতিরোধ কৌশল জানতে পেরে মুঘল বাহিনী স্থানীয় লোকদের সহায়তায় এক অজানা ঘুর পথ আবিষ্কারের মাধ্যমে নানজুর নামক

গ্রামে এসে উপস্থিত হন। সেখান থেকে দাউদকে পশ্চাৎদিক থেকে আক্রমণ করার সুযোগ আসে। এতে দাউদের পরিকল্পিত কৌশল ব্যর্থ হয় এবং তিনি পশ্চাৎদিক থেকে শত্রু বেষ্টিত হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে কটকে প্রেরণ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেন।

মুঘলদের তুলনায় আফগানগণ তেমন শক্তিশালী ছিলেন না। দাউদ খান তাই যুদ্ধ প্রস্তুতির সাথে মুঘলদের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব রাখেন। রাজা টোডরমল সন্ধির প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু মুনিম খান সন্ধি প্রস্তাব গ্রহণ করেন এই শর্তে যে, দাউদকে আসতে হবে এবং সম্রাটকে মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করে তাঁর অধীনে চাকরি করতে হবে; একজন বিশ্বস্ত প্রতিনিধিকে তার পক্ষে আলোচনার জন্য সম্রাটের দরবারে পাঠাতে হবে। এ সঙ্গে আরো কিছু শর্ত ছিল যা দাউদের জন্য সম্মানজনক ছিল না। কাজেই দাউদ খান মুঘলদের সন্ধি প্রস্তাবের শর্ত অগ্রাহ্য করেন। ফলে ৩ মার্চ ১৫৭৫, তুকারয় প্রান্তরে মুঘল বাহিনীর সঙ্গে আফগান বাহিনীর তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রথম দিকে দাউদের বাহিনীর সাফল্য লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত মুঘল বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে দাউদের প্রধান সেনাপতি গুজর খান সহ অসংখ্য আফগান সৈন্য নিহত হয়। পরাজিত হয়ে দাউদ পালিয়ে যান। টোডরমল পশ্চাৎধাবন করলে দাউদ খান কটকের দুর্গে আশ্রয় নেন। মুঘল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে আর কোন সাফল্য লাভের আশা নেই দেখে তিনি মুঘলদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন (১২ এপ্রিল, ১৫৭৫)। মুনিম খান দাউদকে উড়িষ্যায় জায়গীর প্রদান করে তান্ডায় ফিরে আসেন।

ইতোমধ্যে মুনিম খানের অনুপস্থিতির সুযোগে কালাপাহাড় ও বাবুই মনক্লী প্রভৃতি আফগান নায়করা কোচবিহার থেকে এসে ঘোড়াঘাটে অবস্থিত মুঘলদের পরাজিত করে সেখানে আধিপত্য বিস্তার করেন। এই সংবাদ পেয়ে মুনিম খান ঘোড়াঘাটের দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু ঘোড়াঘাটে পৌঁছার পূর্বে গৌড় জয় করেন এবং গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করার কথা ভাবেন। অনেক দিন পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকায় সেখানকার বাড়িঘরগুলো অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়েছিল। অসুস্থ হয়ে কয়েকশ' লোক মারা গেলে তিনি ঘোড়াঘাটে না গিয়ে তান্ডায় প্রত্যাবর্তন করেন। এবং কয়েকদিন পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন (২৩ অক্টোবর, ১৫৭৫)। তাঁর মৃত্যুর পর হাসান কুলী বেগ ওরফে খান-ই-জাহানকে আকবর বাংলার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। এসঙ্গে টোডরমলকে তাঁর সহকর্মী নিযুক্ত করা হয়।

বাংলার শাসনকর্তা মুনিম খানের মৃত্যুর পর দাউদ খান বিহারে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং ভদ্রক ও জলেশ্বর প্রভৃতি মুঘল অধিভুক্ত অঞ্চল দখল করে বাংলায় আধিপত্য বিস্তার করেন। নবনিযুক্ত বাংলার শাসনকর্তা হাসান কুলী বেগ এবং টোডরমল দাউদকে দমনের জন্য সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাংলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। হাসান কুলী বেগ ও টোডরমলের আগমনের সংবাদ পেয়ে দাউদ রাজমহলে আশ্রয় নেন। হাসান কুলী বেগ সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজমহলের নিকটে কয়েক মাস অপেক্ষা করেন। সবশেষে সম্রাট আকবরের নির্দেশে বিহারের শাসনকর্তা মুজাফফর খান ১০ জুলাই, ১৫৭৬ খ্রি. তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ১২ জুলাই, ১৫৭৬ খ্রি. মুঘল বাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণে আফগান বাহিনী রাজমহলে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে আফগানদের তরবারী নামে খ্যাত জনায়েদ নিহত হন এবং কালাপাহাড় ও কতলু খান আহত হয়ে পলায়ন করেন। দাউদ কররানী বন্দি হন এবং সন্ধি ভঙ্গের অপরাধে তাঁকে প্রাণদন্ড দেয়া হয়। এভাবে দাউদের পরাজয় এবং নিধনের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলায় আফগান শাসনের অবসান ঘটে এবং মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সারসংক্ষেপ

শেরশাহ ও তৎপুত্র ইসলাম শাহের আমলে খিজির খান, কাজী ফজীলত, সুলেমান খান (একবার বিদ্রোহ করলেও) প্রমুখ শাসক দিল্লির অধীনস্থ প্রাদেশিক শাসক হিসেবে বাংলায় শাসনকার্য পরিচালনা করেন। শেরশাহের ভ্রাতুষ্পুত্র আদিল শাহ ও তৎপরবর্তী শূর আফগানদের আমলে শামসউদ্দিন মাহমুদ শাহ, প্রথম গিয়াসউদ্দিন, দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দিন, তৃতীয় গিয়াসউদ্দিন এক প্রকার স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেন। অতপর তাজ খান তৃতীয় গিয়াসউদ্দিনকে হত্যা করে নিজেকে বাংলার শাসনকর্তারূপে অধিষ্ঠিত

করার মাধ্যমে বাংলায় কররানী আফগান শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ভ্রাতা সুলেমান কররানী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি বিজেতা হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। রাজ্য সীমানা বৃদ্ধি করে উত্তর-পূর্ব ভারতে শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হন। তাঁর পরবর্তী বাংলার শাসক বায়েজিদ কররানী, দাউদ কররানী তেমন যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। বাংলায় আফগান কররানী বংশের শেষ শাসনকর্তা দাউদ কররানী আকবরের সৈন্যবাহিনীর হস্তে পরাজিত ও নিহত হলে বাংলায় কররানী শাসনের অবসান ঘটে এবং মুঘল শাসনের সূত্রপাত হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)।*
২. রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাস।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শেরশাহ গৌড় থেকে রাজধানী কোথায় স্থানান্তরিত করেছিলেন?
(ক) আগ্রা (খ) দিল্লি
(গ) হায়দারাবাদ (ঘ) বিহার।

২। শেরশাহ কর্তৃক নিযুক্ত বাংলার প্রথম শাসনকর্তার নাম কি?
(ক) খিজির খান (খ) কাজী ফজীলত
(গ) সুলেমান খান (ঘ) মুবারিজ খান।

৩। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর বাংলার কোন শাসক স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন?
(ক) শামসউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ (খ) প্রথম গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর
(গ) দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর (ঘ) তৃতীয় গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর।

৪। বাংলায় কররানী আফগান শাসন কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?
(ক) সুলেমান কররানী (খ) বায়েজিদ কররানী
(গ) দাউদ কররানী (ঘ) তাজ খান কররানী।

৫। কত খ্রিস্টাব্দে মুঘলরা দাউদ কররানীকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে?
(ক) ১৫৭৪ খ্রি. (খ) ১৫৭৫ খ্রি.
(গ) ১৫৭৬ খ্রি. (ঘ) ১৫৭৭ খ্রি.।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। শেরশাহের আমলে বাংলার শাসনকর্তাদের কার্যাবলী বর্ণনা করুন।
২। ইসলাম শাহের আমলে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ দিন।
৩। শূর আফগান শাসক প্রথম গিয়াসউদ্দিন বাহাদুরের শাসনকালের বর্ণনা দিন।
৪। বাংলার কররানী শাসন প্রতিষ্ঠায় তাজ খান কররানীর ভূমিকা লিপিবদ্ধ করুন।
৫। সুলেমান কররানীর উড়িষ্যা বিজয়ের বিবরণ দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। বাংলায় শূর আফগানদের শাসনকালের একটি বিবরণ দিন।
২। বিজেতা হিসেবে সুলেমান কররানীর কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।
৩। আকবরের বাংলা অধিকারের বিশেষ উল্লেখপূর্বক দাউদ কররানীর শাসনকালের বর্ণনা দিন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ

পাঠ-১ ঃ ১। (খ); ২। (ক); ৩। (গ); ৪। (গ); ৫। (খ); ৬। (ক)।
পাঠ-২ ঃ ১। (খ); ২। (ক); ৩। (ক); ৪। (ঘ); ৫। (গ)।